বিশ্বকর্মা পুজোর পর দিন, উন্নয়নের মাঞ্জা আর রংবেরং ঘুড়ির নীচে বন্ধ কলকারখানার হালচিত্র লিখছেন দেবলীনা

লক-আউটের পর। সেলাই যখন ভরসা। ছবি: প্রদীপ গুহ

বাইশ মাস যখন মাইনে নেই, লক্ষ্মী বউদি এক বছরের মেয়েকে নিয়ে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। মন্টুদা টের পেয়ে কোনও রকমে বাঁচান। আজও সেই কথা পরিবারের চোখে জল আনে।

পরিবেশ দূষণের অভিযোগে ট্যাংরা, তিলজলা, তপসিয়ায় কার্যত বন্ধ চামড়া-শিল্প ঘিরে যাবতীয় কর্মকাণ্ড। মূলত দলিত মুসলমান এবং চিনারাই ছিলেন এই শিল্পের পুরোভাগে। সরকারের বিচিত্র নীতি-নির্দেশে বিপুল অর্থের বিনিময়ে চর্মনগরীতে অধিকাংশ ছোট-মাঝারি ব্যবসায়ী উঠে যেতে পারছেন না। ফলত বন্ধ হচ্ছে একের পর এক ট্যানারি। চরম সংকটে হাজার হাজার শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবার। তিলজলা এলাকায় প্রায় সবাই দলিত, বিহার থেকে আসা। রামদাস রাম, নাগেশ্বর রাম, রামসাগর দাস বা হরিন্দর রাম — এক একটি দশ ফুট বাই দশ ফুটে আট-দশ জনের ঘিঞ্জি জীবন। ভেঙে পড়া এক ঝুপড়িতে থাকেন সারদা দেবী, কেশব রাম। চার সন্তানের কেউই আর লেখাপড়া করে না। এক চিলতে উঠোন ঘিরে অন্তত ছ'টি ঝুপড়ি। ম্যালেরিয়া আর পেটের অসুখ নিত্য সঙ্গী। বহু শ্রমিক আন্দোলনের পাশে থাকা, সমাজকর্মী দোলা সেন ঠাট্টা করলেন, নতুন কলকাতার সঙ্গে এই এলাকার একটা সমতা থাকতে হবে তো। এলাকাকে তো সে ভাবে তৈরি করতে হবে। তপসিয়া, তিলজলা, ট্যাংরা থাকলে নতুন কলকাতা কী করে হবে?' হরিন্দর রাম বলছিলেন, কী ভাবে দিনে এখন পঞ্চাশ-ষাট টাকা রোজগার করাও মুশকিল। সবারই আশঙ্কা, ছোট ব্যবসায়ীদের কোণঠাসা করে চর্মশিল্পে একটা শূন্যস্থান তৈরি করা হবে। আর, সেই রাস্তায় বিদেশি বিনিয়োগ ঢোকাবে সরকার। রামসাগর, হরিন্দররা বলছিলেন, চর্মশিল্পে নির্ভরশীল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষের জীবন কী ভাবে তিল তিল করে শেষ হয়ে যাচ্ছে। রামদাস রামের হাহাকার, 'আর কিছু ভাবতে পারি না। এক মরা হুয়া আদমি কেয়া সোচ সাকতা হ্যায়? জিন্দা হোতা তো সোচতা।'

কারখানা বন্ধ হওয়ার আগের 'ভাল ছেলে' বলে পরিচিত বিজয় রাজ, যাঁকে নিয়ে আমাদের এই লেখা শুরু হয়েছিল, আজ সে প্রায় উন্মাদ, মদ্যপ। আমাদেরকে অপ্রাসঙ্গিক বলে বসে, 'রাকেশ শর্মা তো মহাকাশে গেল, চাঁদ ধরতে পারল কি?' তার পরেই হাত জোড় করে বলে, 'আমাদেরকে ছাড়ুন, বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকান। আপনাদের কলমের জোর সব হিলিয়ে দিতে পারে। কিছু একটা করুন।'

কলমের কী জোর জানি না। তবে হয়তো পুজোর বাজার সারতে যাওয়ার আগে একটু জানতে পারা, কেমন আছে আমার কাছের-দূরের-পাশের ঘরের প্রাণ। হয়তো 'দেখিয়া শুনিয়া' কেউ আর 'ক্ষেপিয়া' যায় না। বিজয় শুধু আউড়ে যায়, 'ভয় লাগছে এখানে থাকতে। ভয় লাগছে খুব।'

"এই দেশ আমার স্বাধীন চাই, নইলে পৃথিবীটা আমার উল্টে যাবে।" দু'হাতে মাথা চেপে ধরেন বিজয়কুমার রাজ। নারকেলডাঙা মেন রোডের একশো নম্বর বস্তিতে তখন শেষ বিকেলের মুষড়ে পড়া ক্লান্ত কাহিল আলো। বিজয় রাজ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ান, এক চিলতে ভাগের উঠোনে হাঁটেন, দৌড়ন, বসে পড়েন; কী করবেন, যেন বা বুঝে উঠতে পারেন না। বিড়বিড় করেন। কিছু শব্দ উদ্ধার হয়, কিছু হয় না। অথবা অস্থিরতায় হঠাৎই চেঁচিয়ে ওঠেন। অক্রোধী সেই চিৎকার একশো নম্বর বস্তির সীমানা পেরিয়ে বড় রাস্তা উলট-পালোট, অগোছালো করতে পারে না। বেনিশান চোখ জোড়া চার পাশ দেখে, যে চার পাশ তাঁকে নিয়ে কিছুটা বিব্রত। বন্ধ হওয়া জুট মিলের শ্রমিক পরিবারের মানুষজন মাথায় আঙুল ঠুকে বোঝান, বিজয় এখন মনোব্যাধিগ্রস্ত।

২০০৪ সালের ২৯ মার্চ থেকে জুট মিলের গেটে তালা। বিজয় রাজ-এর মতো সতেরোশো শ্রমিক প্রায় আঠারো মাস ধরে রোজগারহীন। 'শ্যামবাবুর বউ বেবি পাগল হয়ে গেছে', 'দুই মেয়ে, এক ছেলে, বউকে রেখে দিলীপ দে আত্মহত্যা করেছে', 'আর এক জন নিখোঁজ'— শ্রমিক বসতির অসুখী বাতাস ভারী হয়ে থাকে এই সব তথ্যে। প্রতি দিনই যোগ হয় নতুন কোনও বিষাদ-সংবাদ। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় শোকগাথা। এক সময় মনে হতে পারে আলাদা আলাদা কাহিনি নয়, বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকদের বৃত্তান্ত বুঝি বা একটাই।

অথচ মিল বন্ধ হওয়ার কারণ খুঁজতে গেলে অনেক হিসেবই মিলবে না। কারখানা লাভেই চলছিল। নানা ধরনের বস্তা, চট, পাটজাত জিনিস উৎপাদন হত। ইন্ডিয়ান জুট মিল অ্যাসোসিয়েশনের (ইজমা) হিসেব অনুযায়ী প্রতি টন পাটের পিছনে যদি ছত্রিশ জন শ্রমিক লাগে, তবে সেই মিল লাভে চলছে বুঝতে হবে। সেখানে এই মিলে লাগত বত্রিশ জন শ্রমিক। তার পরেও বন্ধ হল মিল। এই মিল স্থানান্তর নিয়ে প্রাথমিক মতভেদ প্রথমে লক আউটে গড়ায়। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ছিল, মজদুর ইউনিয়ন স্থানান্তরের এই তথ্য ২০০১ সাল থেকেই জানত। এখন শ্রমিকরা যদি তার বিন্দুবিসর্গ না জেনে থাকেন, তবে কর্তৃপক্ষের কিছু করার নেই। শ্রমিকদের বক্তব্য কারখানার ৪৮ বিঘা জমি বাম-ঘেঁষা এক উদ্যোগপতির কাছে বিক্রি করে দেওয়াই ছিল কর্তৃপক্ষের মূল উদ্দেশ্য।

কর্তৃপক্ষ-চক্রান্ত, ইউনিয়ন-ধাপ্পাবাজি, সরকার-সন্দেহজনক ভূমিকা— এত শব্দমিছিলের জটিল ভিড়ে এমন অনেক একশো নম্বর বস্তির প্রতিদিনকার সম্বলহীন-অভাবী জীবন গোলকধাঁধায় ঘুরতে থাকে। রামকুমার সিং-এর এখন প্রতি ভোরের গন্তব্য লোহাপট্টি। মাথায় ওঠানোর কাজ করে চল্লিশ বা পঞ্চাশ টাকা রোজ। এই রোজ প্রতি দিনের নয়। কারণ, রামকুমারের মতো বহু মানুষেরই ভিড় জমে লোহাপট্টিতে। স্ত্রী, এক ছেলে, দুই মেয়ের সংসার। বস্তির অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়ানো তাঁর বাচ্চারা সকলেই স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

নিঃস্বকর্মা

সকলেই স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। প্রতি দিন রান্না হয় না। হলেও, দু'বেলা নয়। রামকুমারের স্ত্রী মৃদুলা সিং চোদ্দ বছর আগে বৈশালীর প্রত্যন্ত গ্রাম ছেড়ে শহরে আসেন। 'সব সয়ে যাই, কিন্তু, বাচ্চারা যখন খিদেয় কাঁদে, তখন সহ্য হয় না।' ধরম পাসমলের স্ত্রী মীরা দেবীর বাচ্চা এক মাসের। 'বাচ্চার কোনও দুধই জোটে না। কোথায় পাব? কাজই নেই। আমি খেলে তবে তো ও মায়ের দুধ পাবে। তবু বেঁচে আছে।'

বেঁচে থাকার এই লড়াইয়ের কথাই বলছিলেন রামকুমার, অশোককুমার, মেওয়ালাল গুপ্তারা। ২০০৪-এর অক্টোবরে কারখানার গেটে আট জন ভুখ হরতালে বসেছিলেন। আমরণ অনশন। আকাশভাঙা বৃষ্টিতে ফুলবাগানে কোমর অবধি জল উঠেছিল। তবু গেট ছাড়েননি ওঁরা। তিন দিন পরে মহাকরণ থেকে ডাক এসেছিল। সমাধান-সূত্র মেলেনি। কিন্তু, আমরণ অনশন কীসের দাবিতে ছিল? শ্রমিকদের যুক্ত সংগ্রাম কমিটির এক জন বললেন, 'মজা কী জানেন? আগে কারখানা খোলার জন্য শ্রমিকরা ভুখ হরতাল করতেন। কিন্তু, আজ বাম জমানায় শুধুমাত্র ত্রিপাক্ষিক একটা মিটিং ডাকার জন্য শ্রমিকদের আমরণ অনশনের ডাক দিতে হল। না হলে সরকারবাহাদুরের কানে কোনও কথাই ঢুকছিল না।' যদিও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপ্যুট অ্যাক্টের ১২/৪ ধারায় কিঞ্চিৎ বেকায়দায় কর্তৃপক্ষ, তবুও শ্রমিকদের আশঙ্কা অন্যান্য কারখানার মতো এ জমিও যাবে প্রমোটারের হাতে। 'বড়লোক থাকবে, মজদুর মরবে। বড় বড় বিল্ডিং হবে ওই জমিতে।' এই তো সে দিন হল ২০০৪-এর কলকাতা পুরসভা নির্বাচন। বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তেহারের কিছু কথা মনে করলে, লাল ঝাণ্ডা গুটিয়ে তাকে তুলে বিনিয়োগের লাল কার্পেট পাতছেন যাঁরা, শাসকদলের সেই মরশুমি মার্কসিস্টদের হয়তো একটু হলেও অস্বস্তি হবে— 'আজকে আমাদের সামনে মূল প্রশ্ন হল: এই গরিব-মারা অমানবিক 'বিশ্বায়িত' ব্যবস্থা মেনে নিয়ে কেবল পয়সাওলাদের জন্য একটা ব্যবস্থা তৈরি করব, নাকি গরিব নিম্নবিত্ত মানুষকে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েই বিকল্প উন্নয়নের একটা চেষ্টা করব? বামফ্রন্ট দ্বিতীয় পথটি বেছে নিতে চায়।'

কারখানার বন্ধ গেট যদি খোলেও, ২১৪ টাকার বিধিবদ্ধ ন্যূনতম মজুরির নিয়মকে 'বিকল্প উন্নয়ন'-এর বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অধিকাংশ শ্রমিকই দিনে মাত্র ৫০ থেকে ১০০ টাকা পাবেন। বন্ধ হয়ে যাওয়া 'অত্যাধুনিক' এক জুট মিলের শ্রমিকরা অবশ্য ২৭ টাকা রোজেও কাজ করতেন।

জুট মিল লাইনে সন্ধের ছায়া গাঢ় হয়। 'চিন্তা করতে করতে আর বাঁচার ইচ্ছা হয় না।' 'আটা রহতা হ্যায় তো চাল নেহি, চাল রহতা হ্যায় তো নুন নেহি।' দু'একটা ঘরের জ্যোতিহীন বাল্‌বের আলোয় বিষাদের ছায়া ঘন হয়ে ওঠে। হঠাৎই এক জন খোঁজ করতে শুরু করেন খাসির মাংসের এখনকার দাম। এক দল খেপে এঠেন, 'সাদা ভাত জুটছে না, তুই মাংসের খোঁজ নিচ্ছিস। তাও আবার খাসির!' যখন বেরিয়ে আসছি, মেওয়ালাল গুপ্তা, সর্দার ছিলেন, বললেন, 'যদি আপনার বাবার কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, আর এক-দু'দিন নয়, আঠারো মাস ধরে বন্ধই থাকে, সে দিনই বুঝতে পারবেন। না হলে বুঝবেন না, বোঝা সম্ভব নয়, আমরা কেমন আছি।'

'এনারা জানতে এসেছেন, তোমরা কী সুখে আছো, কী খেয়ে আছো।'

'রাজার সুখে আছি, মদ খেয়ে আছি, বিষ খেয়ে আছি।'

নাম জানা হয় না বন্ধ কোনও কারখানার তিতিবিরক্ত ক্ষুব্ধ সেই শ্রমিকের। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা থেকে চলেছি ময়নাগোর এলাকায়। গন্তব্য গান্যে গঙ্গাধরপুরের বাবুলাল নস্করের বাড়ি। পথে পড়েছে বন্ধ হয়ে যাওয়া ছোট, মাঝারি নানা ধরনের কারখানা। তেমনই একটির শ্রমিক ছিলেন বাবুলালদা। কীটনাশক তৈরি হত এই কারখানায়। ১৯৬২-তে তৈরি হওয়া কারখানা যখন ১৯৯২-এ পুরোপুরি বন্ধ হয়, তখন সেখানে কাজ করতেন পঞ্চাশ জন। বাবুলালদা এখন রাজমিস্ত্রির জোগাড়ি, বাকি যাঁদের খোঁজ জানেন তিনি, তাঁরা কয়েক জন মারা গেছেন। জীবিতের বেশির ভাগই অভাবে অসুস্থ। কেউ গাছ কাটার কাজ করেন, কেউ চালান ভ্যান বা রিকশা। আট ক্লাসে থাকতেই একমাত্র ছেলের পড়া বন্ধ হয়েছে। ইলেকট্রিকের কাজ শিখছে সে। কাজ থাকলে পাওয়া যায় দৈনিক ৪০ টাকা। বাবা ছেলে দুজনেই যদি এক দিনে কাজ পান, তবে পাওয়া যায় ১১০ বা ১২০ টাকা। যদিও সেই সৌভাগ্য প্রতি দিন হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় পঞ্চান্ন হাজার বন্ধ বা রুগ্ন হয়ে যাওয়া কারখানার সঙ্গে জড়িত মানুষগুলোর জীবন এভাবেই চলছে। বাবুলালদার বাড়ির খুব দূরে নয়, শিবরামপুর কাষ্ঠডাঙ্গার ভোলানাথ দাসের বাড়ি। ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় কাজ করতেন। জাহাজের গিয়ার, প্যানেল বোর্ড, ডিফেন্সের টাওয়ার তৈরি হত। ২৭ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা নিয়ে গণ্ডগোলের সূত্রপাত, ১৯৭৮-এ কারখানা বন্ধে তার চির-ইতি। এখন কারখানার ওই ৭৬ কাঠা জমি, যথানিয়মে প্রমোটারের হাতে। আর, ভোলানাথ দাস বা তাঁর মতো আরও অনেকে? ছোট ছোট যে সব কারখানায় খুবই কম সংখ্যক শ্রমিক কাজ করেন, যে সব কারখানা বিভিন্ন বড় কোম্পানিকে নানা রকম জিনিস সরবরাহ করে, যেখানে সাধারণত রোজের ভিত্তিতেই কাজ হয়, শ্রমিকদের অন্য কোনও রকমের সুযোগ-সুবিধা নেই, সেই রকমই এক কারখানায় ৮০ টাকা রোজে কাজ করতেন ভোলাদা। করতেন, কারণ ভাড়া বাঁচানোর জন্যে সাইকেলে অনেকটা পথ যেতে হত। কিছু দিন আগে দুরন্ত গতিতে আসা একটি বাস তাঁর ডান পা-এর দুটো আঙুল নিয়েছে, আর নিয়েছে সামান্যতম এই রোজগারটুকুও। তিন মাসের ওপর

> এই নয়া বাম বিশ্বে বিশ্বকর্মা যন্ত্রবিদ্যা ছেড়ে শুধুই স্থাপত্যবিদ্যায় নজর দিয়েছেন

হাসপাতালে ছিলেন, ধারের খরচে। এ কটা দিন না হয় বেঁচেছেন বন্ধু-আত্মীয়-প্রতিবেশীদের সদিচ্ছায়। কিন্তু, ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই এত মেহেরবান হবে না। তখন? বউ-বাচ্চা নিয়ে সংসার চলবে কী করে? এত কিছুর মধ্যেও ভোলাদার মুখের হাসি মুছে যায়নি। শিল্পায়নের নতুন ঢেউ নিয়ে সরাসরি কিছু বললেন না। রসিকতা করলেন, 'এ সরকার যে ভাবে শেকড় গেড়েছে, এ বার চার দিকে ঝুরি নামার সময় হয়ে গিয়েছে, বুঝলেন?' শোনা গেল অতীতের আশ্চর্য কাহিনিও। ১৯৮০ সালে নিয়মিত গেটে শ্রমিক জমায়েত হলেও দুপুরের দিকটা ফাঁকাই থাকত। এ রকমই এক দুপুরে অন্য এক কোম্পানির লোকজন কিছু মেশিন বার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোর্ট অর্ডার এবং পুলিশ নিয়ে এসেছিল। কারখানা গেট তখন মাঝ-দুপুরে কিছু সময়ের জন্য শুনশান ফাঁকা। কাছেই জোতশিবরামপুর শিক্ষানিকেতন-এর ছাত্ররা এই আনাগোনায় ঘটনা আঁচ করে শিক্ষকদের জানায়। এর পরেই সাইকেলে সাইকেলে বার্তা পৌঁছে যায় শ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি। ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক তখন কারখানা গেটে একজোট। পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পারে না। বাহিনী ফিরে যায়। পঁচিশ বছর পর এই কাহিনি কল্পকথা মনে হয়। এমন আশ্চর্য বৃত্তান্ত আর কি কখনও শোনা যাবে ভোলাদা?

'এখন আর কেউ কারও কথা কান পেতে শোনে না। শোনে? জানি না।'

কান পেতে শুনতে চাইলে, চোখ মেলে দেখতে চাইলে খোদ কলকাতারই কত গলিঘুঁজি থেকে রাজপথে ছড়িয়ে রয়েছে বন্ধ হয়ে যাওয়া অসংখ্য ছোট, বড়, মাঝারি কারখানা। যেমন, বেহালার রায়দিঘি অঞ্চলের এন জি সাহা রোড। ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি, রিসার্চ অ্যান্ড গ্লাস সেরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ, ইসবান পেইন্টস, টেকনিকো এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড। কাছেই রয়েছে কলকাতা থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়া রেকিট অ্যান্ড কোলম্যানের কারখানা। বিশ্বকর্মা সত্যযুগে স্বর্গলোক, ত্রেতা যুগে স্বর্ণলঙ্কা, দ্বাপর যুগে দ্বারকা এবং কলিযুগে হস্তিনাপুর এবং ইন্দ্রপ্রস্থ বানিয়েছিলেন। অর্থাৎ, শুধু যন্ত্রবিদ্যা নয়, স্থাপত্যবিদ্যায়ও তিনি বিরাট পারদর্শী। এই নয়া বাম বিশ্বে বিশ্বকর্মা যন্ত্রবিদ্যা ছেড়ে শুধুই স্থাপত্যবিদ্যায় নজর দিয়েছেন। দিকে দিকে বন্ধ কলকারখানার জমিতে এই যুগে শুধুই বহুতল আর শপিং মল। রেকিটের এক দিকে ৭১৫ একর জমিতেও, যথারীতি বহুতল। না জানি সেই শহরের অ-জানি হিরের রোশনাইয়ের ছিটেফোঁটাও পৌঁছয় না রেকিট-এর সোমনাথ বেরা বা শশাঙ্ক দাস-এর ঘরে। এখানকার শ্রমিক ছিলেন বিশ্বজিৎ দাসও। ২০০২-এ বাধ্য হয়েছেন ভি আর এস নিতে। তার পর থেকে অভাবের নানান অসুখে অন্তত ছ'বার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মাত্র বছর তিরিশের বিশ্বজিতের বাড়িতে যখন গেলাম, বাড়িতে বোন জ্যোৎস্না ছাড়া অন্যরা হাসপাতালে। স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে জ্যোৎস্না। মাস পাঁচেক আগে মা প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছেন। যেন শুনছিলাম একই কাহিনি। কিন্তু, জ্যোৎস্না এর বেশি বলতে পারে না। যেমন বলতে পারেন না বন্ধ হওয়া উষা কারখানার লড়াকু ইউনিয়ন কর্মী মন্টু ঘোষের স্ত্রী লক্ষ্মী। দাদা শঙ্করও ওখানেই কাজ করতেন। এখন স্ত্রীর সঙ্গে সেলাই করে দিন গুজরান। টানা

রবিবাসরীয়
আনন্দবাজার পত্রিকা ◆ ২ আশ্বিন ১৪১২ রবিবার ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫
রবিবারের
আনন্দ